শিল্পী চিত্তপ্রসাদ

চিত্তপ্রসাদের জন্মশতবর্ষে বারে বারে ফিরে দেখা শিল্পী চিত্তপ্রসাদকে। এবার এই ফিরে দেখা কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত-র কলমে।

চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন এমন একজন শিল্পী, যিনি চিত্ররচনাকে মনে করতেন এক ধরনের যুদ্ধ। একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি তো প্রকৃত অর্থে যুদ্ধই করে গেছেন আজীবন। সেই যুদ্ধ ছিল দারিদ্র্য, শোষণ, বঞ্চনা আর পরাধীনতার বিপক্ষে। চিত্রকলা ছিল তাঁর অস্ত্র। চিত্রকলাকে যাঁরা শৌখিন মজদুরি বলে ভাবেন তাঁদের তীব্র বিপরীতে ছিল চিত্তপ্রসাদের অবস্থান। জগৎবরেণ্য শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের সঙ্গে চিত্তপ্রসাদের জীবন ও সাধনায় আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য ছিল। তারা দুজনেই ছবি-আঁকাকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে। ফলে দুজনকেই বরণ করতে হয়েছিল তুমুল দারিদ্র্য। ধনীব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য তাঁরা কোনোদিন ছবি আঁকেননি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই দুই শিল্পীই বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কর্মমুখরতা, তাদের স্বপ্ন ও ভালোবাসাকে। যদিও ভ্যান গঘের ছবিতে ছিল বিচিত্ররঙের প্রবল জোয়ার। বিপরীতে চিত্তপ্রসাদ ছিলেন মূলত সাদাকালোর সম্রাট। কিন্তু তাঁদের দুজনের ছবিতেই লুকিয়েছিল এক তীব্র প্যাশন, যা আজও দর্শকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

চিত্তপ্রসাদের জন্ম ১৯১৫ সালে নৈহাটি শহরে। বাবা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কের একজন সরকারি হিসাব-পরীক্ষক। চাকরির জন্যই অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। সেই ভ্রাম্যমাণ সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান চিত্তপ্রসাদ স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ভর্তি হযেছিলেন চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজে। বাবার ইচ্ছে ছিল চিত্তপ্রসাদকে ডাক্তার করার। পরিবারের বড়ো ছেলে হিসেবে সকলেরই প্রত্যাশা ছিল তিনি পড়াশোনা শেষ করে দ্রুত অর্থ উপার্জনের দিকে মন দেবেন। কিন্তু চিত্তপ্রসাদের আবাল্য শিল্পপ্রেম ততদিনে রীতিমতো অঙ্কুরিত হয়ে মনের মধ্যে গভীর শিকড় বিস্তার করে ফেলেছে। ছবি আঁকতে তো ভালোবাসতেনই, পাশাপাশি মূর্তিগড়াতেও তাঁর খুব উৎসাহ। কুমোরপাড়ায় গিয়ে তিনি সবারর অগোচরে শিখে আসতেন প্রতিমা-

তৈরির কলাকৌশল। চিত্তপ্রসাদের মা ইন্দুমতী দেবী ছাড়া পরিবারের আর কেউ চিত্তপ্রসাদের এইসব কাজকর্মে খুশি ছিলেন না। মায়ের স্বভাব ও আদর্শে ভীষণরকম প্রভাবিত ছিলেন বালকশিল্পী। আর এই মাতৃপ্রভাব সমগ্র জীবনব্যাপী বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তপ্রসাদ। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম-এর বীজ বালকের মনে তাঁর মা-ই প্রথম বুনে দিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী ঘটনাক্রমে ভীষণভাবে আলোড়িত হন চিত্তপ্রসাদ। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারতবর্ষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণ, পূর্ববাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খাদ্যশস্যের হাহাকার ও পরিণামে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি একের পর এক ঘটনার জেরে চিত্তপ্রসাদের জীবনের গতিপথ ঘুরে যায় সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দিকে। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের অনুপ্রেরণায় চিত্তপ্রসাদ জড়িয়ে পড়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। শিল্পীসত্তা ও বিপ্লবীসত্তার মেলবন্ধনে তিনি তখন এক নতুন মানুষ। সেইসময় তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়িয়ে এঁকে বেড়াতেন অজস্র সাদাকালো রেখাচিত্র। সেইসব চিত্রে বিষয় ছিল ক্ষুধাপীড়িত মানুষ। সেইসঙ্গে তিনি আঁকতেন নানারকম রাজনৈতিক পোস্টার। ওই সময়ে সারাদেশে চিত্তপ্রসাদের মতো দ্বিতীয় কোনো শিল্পী প্রায় ছিলেন না বললেই চলে, যিনি ছবিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন হাট-মাঠ-বন্দরে, মানুষের কাছাকাছি। শ্রমে ও নিষ্ঠায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন আদর্শ শিল্পী। তাঁর সেই আদর্শে ধরা দিয়েছিলেন নবীন শিল্পী সোমনাথ হোর। সোমনাথও চিত্তপ্রসাদের চিত্রসফরে সঙ্গী হতেন। তালিম নিতেন ক্ষুধা ও অনাহারকে চিত্রবন্দি করার কলাকৌশলের। পরবর্তীকালে পার্টির নেতারা চট্টগ্রাম থেকে চিত্তপ্রসাদকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে চিত্তপ্রসাদ পরিচিত হয়েছিলেন এক বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধতে ছাপা তাঁর অসংখ্য ড্রয়িং ও কার্টুন চিত্তপ্রসাদকে রীতিমতো বিখ্যাত করে তুলেছে। সে-সময়ে চিত্তপ্রসাদের সহযোদ্ধারা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, খালেদ চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বরা। ১৯৪৩ এ বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মেদিনীপুর জেলা ঘুরে ছবি ও লেখা দিয়ে ‘হাংরি বেঙ্গল’ নামে এক অভূতপূর্ব ডায়েরি রচনা করেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। সেই ডায়েরি ছাপা হলে তার সমস্ত কপি ইংরেজ সরকার কিনে দ্রুত পুড়িয়ে ফেলে। এমনই তীব্র ছিল তার অভিঘাত। ১৯৪৬ সালে সে-সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান পি.সি. যোশি চিত্তপ্রসাদকে বোম্বাইয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিয়ে যান। জীবনের একেবারে শেষ কয়েকটি মাস বাদ দিলে বাকি জীবনের প্রায় সমস্তটাই চিত্তপ্রসাদ বোম্বাই শহরে কাটান। আন্ধেরির শ্রমিকপাড়ায় এক পুরোনো বাড়ির একটি অতি সাধারণ ঘরে একাকী থাকতেন সদাসৃষ্টিশীল চিত্তপ্রসাদ। সেই ঘরে বসেই তিনি এঁকে গেছেন একের পর এক পোস্টার, রাজনৈতিক কার্টুন, করেছেন অসংখ্য লিনোকাট, উডকাট, বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ, নাটকের মঞ্চনির্মাণ ও তার পোশাক পরিকল্পনা, পুতুলনাচের জন্য তৈরি করেছেন স্বকীয় আঙ্গিকের

পুতুল, লিখেছেন পুতুলনাচের স্ক্রিপ্ট, শিল্পকলা সংক্রান্ত প্রবন্ধ আরও কত কী! এই ঘরে বসেই বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে জীবনের সবচেয়ে বড়ো তেলরঙের ছবিটি এঁকেছিলেন চিত্তপ্রসাদ। শুধু ছবির ভেতরে নিজেকে আটকে না রেখে প্রত্যক্ষ আন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন তিনি। এমন নজিরও আছে যে, কোনো এক জনসভায় পুলিশের গুলিতে আহত এক শ্রমিককে বুকে জড়িয়ে তুলে একে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন তিনি। অন্যের জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন একাধিকবার। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে এমন আবেগপ্রবণ, আন্দোলনমুখী, আপোসহীন শিল্পী খুব বেশিদিন গণআন্দোলন ও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারেননি। কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ তাঁকে ক্রমাগত আশাহত করে তুলেছিল। ততদিনে ভারতের বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা এসে গেছে। কিন্তু তাতে খুশি হতে পারেননি চিত্তপ্রসাদের মতো সৎ রাজনৈতিক কর্মীরা। জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকের আপোশ, ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা, দেশভাগ ইত্যাদির বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা চিত্তপ্রসাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে দেয়। তাছাড়া স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বপদ পি.সি. যোশির হাত থেকে বি.টি. রণদিভের হাতে চলে যাওয়ার ফলে দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিও আমূল বদলে যায়। নতুন নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য ও শিল্পকলা হয়ে ওঠে প্রচারসর্বস্ব ও সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট। ১৯৪৯ সালে পার্টির সর্বক্ষণের একনিষ্ঠ কর্মী-শিল্পী চিত্তপ্রসাদ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ করেন। যদিও মার্কসবাদের প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন জীবনের শেষদিন অবধি। পরবর্তী জীবনে যা-কিছু শিল্পকলা তিনি করেছেন তার সবই ছিল মার্কসবাদী মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ। পার্টির বাইরে আসার পর চিত্তপ্রসাদের জীবনে ঘনিয়ে আসে প্রবল সংকট। গ্যালারি-নির্ভর বাণিজ্যমুখী ছবিকে চিরদিন তিনি ঘৃণা করেছেন। তাঁর পক্ষে প্রবাসে বোম্বাই শহরে পেশাদার শিল্পী হিসেবে অস্তিত্বরক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। তবু তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন। একজন বীর যোদ্ধার মতোই জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। প্রবল অভাবের দিনেও দারুণরকম সৃজনশীল ছিলেন চিত্তপ্রসাদ। কাজ থেকে সরে আসেননি একদিনের জন্যেও। আত্মীয়-পরিজনহীন নিঃসঙ্গ এই শিল্পী ভালোবেসেছিলেন এক নারীকেও। যদিও জীবনে তাকে পাননি তিনি। এইসব দিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁর সঙ্গে ভ্যানগঘের তুলনা চলে আসে বারেবারে। লিনোকাট ছিল চিত্তপ্রসাদের প্রিয়তম মাধ্যম। কারণ একটি লিনোকাট থেকে খুব অল্প খরচে একই ছবির অসংখ্য প্রিন্ট বের করে ছড়িয়ে দেওয়া যায় চারিদিকে। ছবিকে সর্বত্রগামী করে তোলার আকাঙ্খার জন্যই জলরং, তেলরং, প্যাস্টেলের মায়া কাটিয়ে লিনোকাটকে শিল্পী তাঁর কাজের প্রধান মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। এই মাধ্যমেই তিনি তৈরি করেছিলেন এঞ্জেলস উইদাউট ফেয়ারি টেলস – ভারতবর্ষের দরিদ্র, শোষিত, অবহেলিত শিশুশ্রমিকদের নিয়ে এক অবিস্মরণীয় সিরিজ। ডেনিশ ইউনিসেফের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

উপলক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে এই সিরিজের ছবিগুলি নিয়ে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছিল। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের স্মৃতি তাঁর পিছু ছাড়েনি, ১৯৫৩-তে একই আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে শিল্পী মহারাষ্ট্রের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন, লিখেছিলেন মর্মস্পর্শী গদ্য। অথচ কী পরিতাপের বিষয়, শিল্পী তাঁর এই ছবিগুলি নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কোনো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেননি। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এগিয়ে আসেননি শিল্পীর এইসব কাজকে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য। কী অপরিসীম বুকভাঙা দুঃখ আর হতাশা নিয়ে যে তিনি অবিরাম কাজ করে গেছেন – একথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। অবশ্য একেবারেই যে স্বীকৃতি পাননি চিত্তপ্রসাদ, একথা ঠিক না। তাঁর অসংখ্য কাজ স্বদেশে তো বটেই বিদেশেও পেয়েছে সমাদর ও সম্মান। তাঁর ছাপাই ছবি নিয়ে ছোটো ছোটো প্রদর্শনী হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যান্ড ও আমেরিকায়। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। চেক চলচ্চিত্রকার প্যাভেল হোবল চিত্তপ্রসাদের জীবন ও ছবি নিয়ে তৈরি করেছেন তথ্যচিত্র। তবু একথাও সত্যি যে স্বদেশে শিল্পীর কাজ জনপ্রিয়তা পেলেও স্বয়ং শিল্পী ছিলেন উপেক্ষিত। বোম্বাই থেকে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ফিরে এসে যখন শিল্পী চলচ্ছক্তিহীন হয়েও সৃষ্টিকর্মে মগ্ন, তখনও তাঁকে নিয়ে আগ্রহ দেখাননি প্রায় কেউই। ১৯৭৮ সালে শিল্পীর প্রয়াণ হয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে। চিত্তপ্রসাদের মৃত্যুর পর শ্মশানযাত্রী হিসেবে দশজন লোকেরও সমাগম হয়নি। যে সমাজকে ভালোবেসে অবিরাম শিল্পসৃষ্টি করে গেছেন চিত্তপ্রসাদ, সেই সমাজ তাঁকে দিয়েছে উপেক্ষা, অসম্মান আর নিদারুণ অর্থকষ্ট। যাঁদের জন্য তিনি ছবি এঁকেছিলেন তাঁরা ছবি কেনার মতো আর্থিক অবস্থার মানুষ ছিলেন না। আর যাঁরা ছবি কেনেন তাঁরা কখনও মনোযোগী হননি চিত্তপ্রসাদের ছবির মৌলিকতায়।

চিত্র পরিচিতি : ১। চিত্তপ্রসাদ, শিল্পী :কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত।